উত্তরঃ ভূমিকা : সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে একটি অন্যতম শিল্পকর্ম। এ উপন্যাসে একটি অরণ্যচারী নারীর সংসার জীবনে প্রবেশ এবং সামাজিক লোকাচার জীবনযাপনের ব্যর্থতার কাহিনিকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। যে অরণ্যচারিণী নারীকে ঘিরে এ উপন্যাসের সৃষ্টি তার নাম কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করেই সব ঘটনা ও চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি দুহিতা, মানব সাহচর্য বঞ্চিতা এক নারী। তার চরিত্রে পরিস্ফুটিত হয়েছে সারল্য, অভিমান, সততা, ত্যাগ ও মমতার মত দুর্লভ মানবিক গুণাবলি। এখন আমরা লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণের আলোকে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

'কপালকুণ্ডলা'র প্রাথমিক পরিচয় : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কপালকুণ্ডলা। সে অরণ্য সরলতায় উদ্ভাসিত একটি নারী বা প্রকৃতি পালিত কন্যা। সে ব্রাহ্মণ কন্যা কিন্তু বাল্যকালে খ্রিষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হয়ে 'যানভঙ্গের' কারণে সমুদ্র তীরে পরিত্যক্ত হয়। কাপালিক তাকে সমুদ্র তীরে 'কুড়িয়ে' পেয়ে প্রতিপালন করে। নির্জন বনে সে অধিকারীর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং ধর্মীয়বোধ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে। ছোটবেলা থেকে সে কাপালিকের তান্ত্রিকতা এবং তার নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছে। তার চরিত্রে সৎ, নির্ভীক, সাহসী, সহজাত, পরোপকার প্রবৃত্তি, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

সর্বপ্রথম কপালকুণ্ডলা চরিত্রের যে দিকটি আমাদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে তা হলো Strangenses. কপালকুণ্ডলার উপস্থাপনা থেকে নদীগর্ভে আত্মবিসর্জন পর্যন্ত চরিত্রের মৌল উপাদান এই বিচিত্রতা দীপশিখার ন্যায় সমান রহস্যলোক বিকিরণ করেছে। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে (সমুদ্রতট) সে আকস্মিক ঝড়ো হাওয়ার মতো উপস্থিত হয়ে 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' উক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনিতে গতির সঞ্চার করেছে। ঔপন্যাসিক তার পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকটা কাব্যিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন–

"ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্ত্তি; সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার– অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুম্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।"

নারীরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সে সৌন্দর্য বিশ্ব সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত। কপালকুণ্ডলার এই রূপ বর্ণনার মধ্যেই তার চারিত্রিক সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলার জীবন যেন সমুদ্র এবং অরণ্যের মিলিত রূপ। এই মিলিত রূপই বলে দেয় কপালকুণ্ডলা জটিল সমাজ জীবনের স্বেচ্ছাবিহারিণী স্বাধীনতার প্রতীক। তাছাড়া কপালকুণ্ডলার মিতভাষিতা তার চরিত্রকে অনেকটা দুর্বোধ্য করে তুলেছে। যেমন– "কোথা যাইতেছ? যাই ও না। ফিরিয়া যাও– পলায়ন কর।"

উদার মানসিকতার পরিচয় এবং পরোপকার কপালকুণ্ডলা চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"– এ উক্তির মধ্য দিয়েই তা প্রমাণিত হয়। আসলে অরণ্যে প্রতিপালিত কপালকুণ্ডলার পরোপকারী ধর্ম হলো সহজাত প্রবৃত্তি। তাই সে নবকুমারকে পৌঁছে দিয়েছে তার গন্তব্যে।

পরদুঃখকাতর ও সহানুভূতিশীল : কপালকুণ্ডলা অন্যের দুঃখে কাতর ও অন্যের প্রতি যে সহানুভূতিশীল হৃদয়ের অধিকারী ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কপালকুণ্ডলা কর্তৃক উপন্যাসের নায়ক নবকুমারের প্রাণ রক্ষার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় যে, বিপদসঙ্কুল নির্জন অরণ্যে সহযাত্রীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে উপন্যাসের নায়ক নবকুমার শবসাধকতান্ত্রিক কাপালিকের হাতে পড়ে। এ অবস্থায় চিন্তিত নবকুমারের সাথে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ ঘটে। নবকুমারকে দেখতে পেয়ে কপালকুণ্ডলার দৃষ্টিতে উদ্বেগের ছায়া ফেলেছিল এবং সে নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করে– "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" অরণ্যে প্রতিপালিত হলেও এ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কপালকুণ্ডলার মানবিক সত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার বহু মানবিক সত্তা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে অন্যের বিপদে সহানুভূতিশীল ও কাতরতা প্রস্ফুটিত হয়েছে যখন আমরা দেখতে পাই যে কাপালিক নবকুমারকে ভৈরবী পূজায় বলি দেয়ার জন্য নিয়ে যেতে থাকে; কপালকুণ্ডলা কাপালিকের খড়্গ লুকিয়ে রেখে কৌশলে আসন্ন মৃত্যু থেকে নবকুমারকে উদ্ধার করে এবং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। এসবের মধ্য দিয়ে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের পরদুঃখকাতরতা ও সহানুভূতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

সমাজ-সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ : কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার করে অধিকারীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। যদিও সে জানত তার এ পরোপকারের জন্য কঠিন শাস্তি গেতে হবে– তারপরও সে দৃঢ়চেতা, নির্ভীক। তার এই চারিত্রিক দৃঢ়তাও কাপালিকের নিকট থেকে পাওয়া। কেননা 'অন্তকরণ সম্বন্ধে সে কাপালিকের সন্তান'। তার আচরণের মধ্যে সঙ্কোচহীনার সাহস ও আশ্রয়হীনার দীনতা আছে। অধিকারী যখন কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের শাস্তি থেকে বাঁচাতে নবকুমারের সাথে বিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে বলেছে তখন কপালকুণ্ডলা আশ্চর্য হয়ে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছে– "বি-বা-হ!" বিবাহ সম্বন্ধে তার উক্তি– "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?" কপালকুণ্ডলার মুখনিঃসৃত এ উক্তি থেকে বুঝতে পারি সমাজ, সংসারের নিয়মকানুন সম্পর্কে সে কত জ্ঞানহীন ছিল। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এমনকি ইংরেজি সাহিত্যে অথবা বিশ্বের অন্যান্য সমৃদ্ধ সাহিত্যেও কপালকুণ্ডলার মতো এমন অরণ্য সরলতায় উদ্ভাসিত, প্রেমোপলব্ধিহীন, নিজের জীবনের মায়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন চরিত্র আর একটিও নেই।

কপালকুণ্ডলার মধ্যে ধর্মবোধ প্রবল ছিল। কিন্তু সমাজ সংসার সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সংসার জ্ঞান সম্পর্কে সে আরেকবার নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দেয় যখন সপ্তগ্রামের পথে পদ্মাবতীর দেওয়া হীরা আর স্বর্ণের গহনা ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়। গহনা নিয়ে ভিক্ষুক দৌড়ে চলে গেলে সে ভাবে– "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?"

দেবদেবী বিশ্বাসী : 'কপালকুণ্ডলা' প্রকৃতিলালিত সামাজিক সাহচর্য বঞ্চিতা। যে দু'জন মানুষ তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের একজন কাপালিক এবং অন্যজন অধিকারী। কাপালিকের তন্ত্র সাধনার প্রভাবে তার মনে কালিকানুরাগ জন্মেছিল; আর অধিকারীর সাহচর্যে ও শিক্ষায় সে বালিকার মধুর রূপ ধ্যান করতে শিখেছে। তাই সে অদৃষ্টবাদের বিশ্বাস অধিকারীর নিকট থেকে পেয়েছে। এজন্য বিয়ের পর স্বামীগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে সে দেবীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিল। তা থেকেই কপালকুণ্ডলার ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

সরলতা ও মমত্ববোধ : লেখক বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা চরিত্রে সরলতা ও মমত্ববোধের চিত্র তুলে ধরেছেন অনুপম সৌন্দর্যে। যেহেতু কপালকুণ্ডলা ছিল অরণ্যবাসী তাই লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে তার কোনো ভাবনা ছিল না। এমনকি স্বামীর সংসারে এসেও সে নিজেকে প্রচলিত সামাজিক করে তুলতে পারেনি। স্বামীগৃহ সপ্তগ্রামে আসার পর মতিবিবি যখন তাকে গহনা পরায় তখন সে সংকোচবোধ করেনি। আবার সে গহনা ভিখারিকে দিতেও কুণ্ঠিতবোধ করেনি। এখানে তার চরিত্রে দানশীলতার চেয়ে সরলতা ফুটে উঠেছে। আবার অরণ্য ছেড়ে আসার সময় তার দুঃখ হয়েছিল কি না তা জানা যায় না। তবে অধিকারীকে ছেড়ে আসার সময় সে কেঁদেছিল। এর মূলে রয়েছে সহজাত মমত্ববোধ।

দৃঢ়চেতা এবং স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা : সমুদ্রতীর বাসিনী কপালকুণ্ডলার চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তার অদম্য প্রবল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তাই সে তার ননদ শ্যামার উপকারার্থে রাত্রিকালে একাকী বনের মধ্যে ঔষধি সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। স্বাধীন অরণ্যচারী জীবন বিসর্জন দিতে সে রাজি নয় এতে নবকুমারের অসন্তুষ্টি ঘটলেও কপালকুণ্ডলার যেন কিছুই করার নেই। কপালকুণ্ডলা বলেছে 'যদি জানিতাম যে বিবাহ স্ত্রীলোকের দাসীত্ব তবে বিবাহ করিতাম না।" আসলে সংসার ধর্ম তার চরিত্রের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। যেখানে মুক্ত অরণ্য তার সহচরী সেখানে সংস্কার, গণ্ডিবদ্ধ সমাজ সংসার তাকে আকৃষ্ট করতে না পারাই স্বাভাবিক। কারণ প্রকৃতিকন্যা কখনো গৃহকন্যায় রূপান্তরিত হতে পারে না। নবকুমারের সাথে এক বছর সংসার করেও তার সংসারের প্রতি বা নবকুমারের প্রতি আসক্তি জাগেনি। শেষপর্যন্ত পদ্মাবতী যখন কপালকুণ্ডলাকে বলে 'আমার ও প্রাণ দাও, স্বামী ত্যাগ কর :' তখন পদ্মাবতীর এ উক্তিতে অস্বীকৃত হওয়ার মত কিছু পায়নি– কপালকুণ্ডলা 'অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না তবে কেন লুৎফুন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?"

সতী-সাধ্বী নারীর চিত্রায়ণে কপালকুণ্ডলা উজ্জ্বল হয়ে আছে। স্বামীর সংসারে এসে কপালকুণ্ডলা প্রায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আযৌবন আরণ্যক পরিবেশ তার চরিত্রে কিছু স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে। তা হলো সংস্কারের বিচিত্র বিধিনিষেধের প্রতি অবজ্ঞা এবং এ অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে তার দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ননদ-শ্যামা সুন্দরীর সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে। কপালকুণ্ডলা তার ননদ-শ্যামাসুন্দরীর জন্য বন থেকে একটি ঔষধি তুলে আনতে চাইলে শ্যামাসুন্দরী তাকে নিষেধ করে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা শ্যামার বাধাকে উপেক্ষা করে একাকী সেই বিজন বনে রাতের অন্ধকারের মধ্যেই গমন করে।

প্রকৃতি প্রেমী : স্বামীগৃহে এক বছরের অধিক সংসার করার ফলে তার বেশভূষায় কিছুটা পরিবর্তন ও সামাজিক রীতি সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান হলেও কপালকুণ্ডলার মূল প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। সপ্তগ্রামে সংসার জীবন তাকে বাঁধতে পারেনি। কপালকুণ্ডলা সবসময় অরণ্য সমুদ্রের কথা ভেবেছে। প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের আধার, অরণ্য সমুদ্র তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। সে সংসার সুখে উদাসীন, নিরাসক্ত এর মূলে রয়েছে প্রকৃতির আরণ্যক সৌন্দর্যের প্রতি তার অগাধ প্রেম।

ত্যাগী ও অভিমানী : কপালকুণ্ডলার চরিত্রে আমরা ত্যাগ ও অভিমানের চিত্র দেখতে পাই। যখন নবকুমারের পূর্ববিবাহিতা ধর্মান্তরিত স্ত্রী পদ্মাবতী ওরফে লুৎফুন্নিসা নবকুমারের দেখা পেয়ে স্বামীকে ফিরে পাওয়ার বাসনায় ব্রাহ্মণ বেশে কপালকুণ্ডলার কাছে স্বামী ভিক্ষা করল, তখন সে নিজের মনের মধ্যে সঙ্গীরূপে কাউকে খুঁজে পায়নি। তাই সে সংসারের প্রতি স্বামীর অনুরাগ আসক্তি ত্যাগ করে পদ্মাবতীর অনুরোধে এককথায় স্বামী ত্যাগের সিদ্ধান্ত করল এবং বলল, "তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার মানস সিদ্ধ হউক কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোনো সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" এ উক্তির মাধ্যমে কপালকুণ্ডলার চরিত্রে ত্যাগ ও অভিমানের সমাবেশ ঘটেছে এ কথা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হয় না।

কপালকুণ্ডলার পরিণতি : কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টলোকে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সে নবকুমারের সঙ্গে বন থেকে চলে আসার সময় দেবীর পায়ে বিল্বপত্র দিলে তা প্রতিমা চরণচ্যুত হলে সে ভীত হয়। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় এ যাত্রা শুভ নয়। সে শেষপর্যন্ত এ ধারণা পোষণ করে যে, 'যাহা বিধাতা করাইবেন তাহাই ঘটিবে।' এতে তার চরিত্রে নিয়তিবাদের প্রতি বিশ্বাসই প্রমাণিত হয়েছে। শেষ সময়ে কাপালিকের দর্শন পেয়ে দেবীর নামে বলী হতে শ্মশানে গমন করে; যদিও নবকুমার তাকে নিয়ে যায় তবু এ গমন তার স্বেচ্ছাকৃত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কপালকুণ্ডলাকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করতে পারে না। নবকুমার তাকে বাড়ি ফিরতে অনুরোধ করলে সে জানায়–

"আমি অবিশ্বাসী নহি। একথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি– নিশ্চিত তাহা করিব।"

কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সাংকেতিকতা যা বৃহত্তর সমাজের আভাস এনে দেয় এবং এরই জন্য নৈসর্গিক শক্তির মধ্যকার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। 'সমুদ্রপ্রকৃতিপালিত' কন্যা সমুদ্রের মধ্যেই চিরবিশ্রাম লাভ করেছে। সমাজ-সংসারের নীচতার কাছে সে পরাজিত হয়নি। প্রকৃতিকন্যা তার প্রকৃতিতেই বিসর্জিত হয়েছে। লেখকের ভাষায়–

"নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন। কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।"

উপসংহার : মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে এত নিস্পৃহ, এত উদাসীন জীবনের প্রতি, স্বামীর প্রতি, স্বামীর ভালোবাসার প্রতি– এই গভীর নিরাসক্তি তাকে চরম ব্যক্তিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। সে সমাজ সংসারের নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, আপন বৈশিষ্ট্যে অটল থেকেছে। বস্তুত প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে যাওয়া কপালকুণ্ডলা চরিত্র বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। সে দিক থেকে কপালকুণ্ডলা চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমগ্র উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা চরিত্র সৃষ্টিতে এক অনুপম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নারীর সহজাত গুণাবলি ত্যাগ, ধর্মপ্রাণ, পতিপ্রাণা, আরণ্য, উদারতা ও সতিত্বের গুণাবলিতে কপালকুণ্ডলা লেখকের এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। সুতরাং উপন্যাসের এসব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে কপালকুণ্ডলাকে এ উপন্যাসের নায়িকা বলে ধরে নেওয়া যায়।